অবকাশ

কেমন লাগছে 'অবকাশ'? জানান আপনাদের মতামত। থাকে যদি কিছু পরামর্শ, তাও জানান। সানন্দে গ্রহণ করব আমরা।
আরও কিছু জানতে বা জানাতে এবং লেখা পাঠাতে-ঃ -
মোবাইল ৯৫৬৪০৬৫৫৫৫ অথবা ই-মেল lipiarambagh@gmail.com
যে ঠিকানায় লেখা পাঠাবেন -
দেবাংশু চক্রবর্তী, আর্থিক লিপি, ওয়ার্ড নং ৪, কোর্ট পাড়া, পোঃ-আরামবাগ, জেলা ঃ হুগলি, পিন-ঃ ৭১২৬০১

সংসার

আশিসবরণ সামন্ত

কিন্তু এত সব করা সত্ত্বেও মন টানতে পারেনি চিত্রিতার। শিক্ষিত বাঙালিরা যেভাবে পায়রার খোপ তৈরি করে নিজেদের জাহির করতে চায় চিত্রিতা আদৌ তার ব্যতিক্রম নয়।

স্বামী আর শিশু পুত্রকে নিয়ে শহরে চলে গিয়ে পায়রার ছোট খোপ বানাতে চেয়েছে সে। এটাই যেন নারী-মুক্তি। এর জন্য আন্দোলন করতেই অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালি নারী আজ ব্যস্ত। ছেলেরাও চাপে পড়ে টাকা খরচ করে শান্তি কিনতে বাধ্য হয়। ঋষিণও শান্তি কেনার লোভে বাড়ি ভাড়া নিয়েছে কোলাঘাটে। কিন্তু, শান্তি কি এতই সহজলভ্য, যে চাইলেই পাওয়া যাবে? এর জন্য সাধনার দরকার। সহযোগিতার প্রয়োজন।

সকালে উঠে দাদুভাইকে নিয়ে বসেছেন মতীশবাবু। পড়াচ্ছেন আর খেলাচ্ছেন। বৌমা চিত্রিতা এসে হাজির সেজেগুজে। ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ নিয়ে। এসেই বলে— ব্রতকে দিন। আমরা একটু বাইরে যাব।

বাইরে যাব বলতে? চেকআপ করাতে যাবে? হ্যাঁ, তা ঠিক। অনেকদিন চেকআপ করানো হয়নি।

আগে এভাবেই সকালের দিকে নিয়ে যেত চিত্রিতা চেকআপ করাতে। পোলিও ভ্যাকসিন খাওয়াতে। মতীশবাবু বলেন— দাদুভাই, আজ আর পড়া নয়, থাক। আজ মায়ের সঙ্গে যাও, এখুনি ফিরে আসবে। আমরা দুপুরে খেলা করব। পড়া করব।

ব্রতকে চিত্রিতার কোলে দেন। চিত্রিতাও কোনও কিছু না বলে কোলে তুলে নিয়ে বাইরে বের হয়ে যায়। পাশের ঘর থেকে গুটি গুটি পায়ে বের হয় যায় ঋষিণ। বাবার কাছে এসে সামনাসামনি সত্যিকথা বলে যেতে পারেনি সে। হয়ত লজ্জায়, ভয়ে, নয়তো বা মানসিক আঘাত পেতে পারেন, এই আশঙ্কায়। প্রায় পঁয়ষট্টি বছরের তাজা তরুণ মনটার কাছে তারা এখনও শিশু। শিশুর মতই কাজ করল।

একটু বেলা হলে বৈঠকখানায় গিয়ে বসেন মতীশবাবু। নিয়মিত অনেকেই বেড়াতে আসেন। আজও এসেছেন। সহকর্মী, সহপাঠী বা সমবয়সী, যাদের অনেকেই আবার সমব্যথী। টেবিলের দিকে তাকাতেই দেখেন পেপার ওয়েট চাপা একটি খাম। সাতসকালে এই খামটি কে রেখে গেল, কে জানে! তুলে নেন। খুলে পড়েন—

পূজনীয় বাবা,

যে কথা বলি বলি করেও বলতে পারিনি, আজ তা লিখে জানাতে হচ্ছে। আপনি প্রায়ই বলতেন— পয়সা দিয়ে সব কিছু পাওয়া যায় কিন্তু শান্তি পাওয়া যায় না। এখন আমাকে পয়সা দিয়ে শান্তি কেনার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। আজ আমি আপনার ব্রতকে কোলাঘাট শিশু নিকেতনে ভর্তি করতে চলেছি। আমরা সেখানেই থাকব। একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছি। চিঠিটা পড়তে পড়তে থেমে যায় মতীশবাবু। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে চিঠিটা ভাঁজ করে খামের মধ্যে ঢোকান। তারপর পকেটে রাখেন।

একটু আনমনা দেখে সহপাঠী তথা সহব্যথী মি. পি. রায় বলেন— কী ব্যাপার মতীশ? এমনটা তো তোমাকে কখনও দেখিনি। কী হলো?

—না, তেমন কিছু হয়নি। ওই প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে পাঁচজনের বাড়িতে আজকাল যা হয় তাই হয়েছে।

—কেন ঝগড়াঝাটি?

—তা হবে কেন, সে সুযোগই তো আর নেই। ও সব সাহিত্য ছাড়ো। সোজা বাঙলায় বলো— আমার ছেলে আর বৌ, ছেলে মানুষের জন্যে শহরে বাস করতে গেছে। গ্রামে এই সব পুরানো বুড়ো হাবড়াদের কাছে থেকে কী আর আধুনিক কায়দা রপ্ত করা যাবে? যেটা আজকাল নাকি ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে আজ আমরা কোথায় চলেছি বলতে পারো? একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন মতীশবাবু। সে দীর্ঘ বাতাস পাক খেতে খেতে সারা ঘরময় ঘুরে শেষে নিজেই জানালা দিয়ে বের হয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

তখনই একটি কথা শোনালেন মি. রায়।

—জানো, প্রতিযোগিতা। সব সময় প্রতিযোগিতা। একে অপরকে টেক্কা দিতে এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা। এটাই তো আধুনিক সভ্যতা, অত্যাধুনিক জীবনমুখীনতা। আরও সহজে বলা যায়, মর্ডান কালচার। এই সে দিন আমি আমার ছেলের বাসায় গিয়েছিলাম। দেখি, ঘর ভর্তি সব জিনিস। টিভি, স্টিরিও, ওয়াশিং মেশিন থেকে শুরু করে হাজারো জিনিস। কিচেনে গিয়ে দেখি, বেশ নামিদামি কম্পানির ফ্রিজ। বৌমাকে বলি— বৌমা দেখি তোমার ফ্রিজে কীরকম সব খাবার দাবার আছে? চুপি চুপি বৌমা বলে— জানেন বাবা, পাশের বাড়িতে ফ্রিজ আছে। তার থেকে ভালো না কিনলে ঠিক চলছিল না। প্রেসটিজের ব্যাপার, তাই, আপনার ছেলে গত মাসে নিয়ে এসেছে। ফ্রিজটা খুলে দেখি ভেতরে কিছুই নেই। একেবারে ফাঁকা। গোটা দুই গাছপাকা তালের মাড়ি একটা ডিসে করে রেখেছে। পরক্ষণেই বলেন—

তোমার ছেলে বউ গেছে, এ আর নতুন কোথা কী? একদিন না একদিন তো যেতোই।

— তবে কি জানো, যে কথাটা আমাকে বললে সহজেই হত— তা আমাকে না জানিয়ে এত জটিল করার কারণ কী।

কারণ একটাই, অজ্ঞতা। সামাজিক তাবোধের অভাব। মানসিক অপরিপূর্ণতা। এখন দুটো জিনিস আমাদের পিষে মারছে। এক, ওদের না জানিয়ে এভাবে চলে যাওয়া। দুই, আমার দাদুভাই এর ছবি।

দুটোই কঠিন। তা হলেও সইতে হবে। এটাই হয়তো জাগতিক নিয়ম। মতীশবাবু নিজেকে খুবই অসহায় বোধ করতে থাকেন। এক সময় বলে বসেন— আচ্ছা, ওরা তো অকারণে চলে গেল। এভাবে কি সব বাড়িতেই যায়? সারা বিশ্বে যায়?

—তুমি যেভাবে নিজেকে নার্ভাস করে তুলছো তাতে মনে হয় যেন বিরাট একটা কিছু ঘটে গেছে।

—তুমি এই ঘটনাটাকে সামান্য বলবে? আমি সারা জীবন আনন্দ করে হৈ হুল্লোড় করে কাটিয়ে এই শেষজীবনে নিঃসঙ্গ হয়ে স্বপ্ন দেখবো?

আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? তুমি কি এই পৃথিবীতে চিরদিন থাকবে? তোমার ছেলে বৌ-নাতি এরাও কি অমর? আজ ওরা যদি জাগতিক নিয়মে তোমার বাড়িতে না জন্মে তোমার পাশের বাড়িতে জন্মাতো? যে মেয়েটিকে বৌমা করে এনেছো সে যদি পাশের বাড়ির বৌমা হতো? এ সব চিন্তা করলে পাগল হয়ে যাবে। এই জগৎটাই বিরাট একটা রঙ্গমঞ্চ। সবাই এখানে অভিনয় করে চলেছে। মতীশবাবু বলেন— সবই ঠিক। কিন্তু...

—কোনো কিন্তু টিন্তু নয়। আমি তোমার কথা চিন্তা করেছি। একটা ঠিকানা দিচ্ছি। এই ঠিকানায় তোমার কী কী হয়েছে বিশদ জানিয়ে চিঠি দাও। দেখবে ওরা কিছু টাকা নেবে, কিন্তু তোমার সংসার ঠিক ভরে উঠবে। তুমি প্রয়োজনীয় বিল দিয়ে দেবে জানিয়ে দিও। আরও জানাবে প্রতিদিন এভাবে চাও নাকি সপ্তাহে এক বা দুদিন? তারপর ঠিকানা লিখে মতীশবাবুর হাতে ধরিয়ে দিলেন। মতীশবাবুও যথা সময়ে পত্র দেন। এতো তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা হবে ভাবতে পারেননি তিনি। দিন তিনেক পরে একদিন সাতসকালেই কলিং বেজে ওঠে। সেই সঙ্গে ভেসে আসে, বাইরে থেকে সুমধুর শিশুকণ্ঠ। দাদু— আমি এসে গেছি। আমায় পড়াবে যে, আমার সাথে খেলা করবে যে। দরজাটি খোলেন। দেখেন— ব্রতর অবিকল নকল একটি ছেলে। সঙ্গে ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ নিয়ে অবিকল ঋষিণ ও চিত্রিতা। প্রথমে একটু থতমত খেয়ে গেলেও নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন— ঠিক চিনতে পারছি না তো—। ভদ্রলোক এ্যাটাচি খুলে একটি কনট্রাক্ট ফর্ম বের করে ধরলেন সামনে। মতীশবাবু প্রতিটি অক্ষর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে থাকেন। সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। নকল সংসার বসানোর চুক্তিপত্র। পড়েন— আর মুখের দিকে তাকান।

ভদ্রলোক বললেন--- আমরাই উদ্যোক্তা। এদেশে আগে ছিল না। ইদানীং সমাজের কথা চিন্তা করে আমরা করেছি। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে এর প্রচলন আছে।

মতীশবাবু কন্ট্রাক্ট ফর্মে সই করলেন। অনুমিতা এদের পেয়ে দারুণ খুশি। প্রায় জড়িয়ে ধরে বললেন— কখন এলি? সারাদিন সংসার বসে তাদের বাড়িতে। সন্ধ্যার পর পেমেন্ট নিয়ে চলে যায়। এইভাবে চলতে চলতে একদিন তারাই বলে— দিন দিন ফিরে না গিয়ে যদি আমরা সদস্য হিসাবে থেকেই যাই?

মতীশবাবু তাকালেন। নিজের বুকের কাছে তৃতীয় কান পেতে শুনলেন জল তরঙ্গের শব্দ। নতুন সংসারের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

সমাপ্ত

নাটক ঃ গোপালের উপহার

নাট্য রচনা ঃ দেবাংশু চক্রবর্তী — **শেষ পর্ব**

মহারাজ : কী যে বললে, মাথামুন্ডু কিছুই তো বুঝতে পারলাম না। কবি, একটু ব্যাখ্যা করে বলতো দেখি।

কবি : মহারাজ, গোপাল এই কবিতাতে বলতে চেয়েছে যে, রাজা, মন্ত্রী এঁরা পদামর্যাদায় সবার মাথার উপর আছেন ঠিকই, কিন্তু অন্তর্যামীই একমাত্র জানেন, সেরা বুদ্ধিমান কে।

মহারাজ : যাক অনেক হয়েছে। এবার সভা মুলতবি করি। কাল সকলের সামনেই আমার সিদ্ধান্ত জানাব। রানীমাও উপস্থিত থাকবেন। গ্রামবাসীরাও থাকবেন। সেখানেই পুরস্কারটা সেরা বুদ্ধিমানের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

(রাজা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার বলে চলে গেলেন। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে প্রতি নমস্কার করলেন)

৭ম দৃশ্য

(মহারাজ আগমনের ঘোষণা, সঙ্গে রানী)

(রাজসভার প্রোটোকল মেনে সকলে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার, গ্রামবাসীরা রয়েছেন। মঞ্চের মাঝখানে একটি গামলা)

সকলেই গামলা দেখিয়ে মুখ চাওয়াচায়ি করছেন।

মহারাজ : বসুন বসুন সকলে। গতরাতে অনেক ভেবেছি, তোমাদের রানীমার সাথেও আলোচনা করেছি। তা যেটা ঠিক হয়েছে, সেরা বুদ্ধিমান গোপালই।

সকলে : সাধু, সাধু, মহারাজ। (শুধু মন্ত্রী বাদে)

মহারাজ : এবার তোমাদের রানীমা পুরস্কার হিসাবে গামলাটিকে গোপালের হাতে তুলে দেবেন।

(সকলে নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছে। মন্ত্রী মিচকে মিচকে হাসছে)

গোপাল : পুরস্কার, গামলা মহারাজ!

রানী : এটা কী হলো মহারাজ? এটা আপনি ঠিক করলেন না।

গোপাল : দিন দিন। গামলাই দিন। বুদ্ধি থাকলে সবই কাজে লাগানো যায় রানীমা।

মন্ত্রী : ঠিক হয়েছে মটুরামের, বেশ জব্দ হয়েছে। (একেবারে গদগদ হয়ে মহারাজকে হেঁট হয়ে প্রণাম) প্রণাম মহারাজ।

রাজা : উফ, ওঠো ওঠো। আবার সেই তেল মাখানো।

(সকলে হো হো করে হেসে উঠলো। রানী গোপালের হাতে গামলাটি তুলে দিলেন। (সকলে হাততালি)

গোপাল : মহারাজ, একটা কথা আছে আমার।

রাজা : আবার কী কথা শুনি?

গোপাল : এই পুরস্কার তো আমার দরজা দিয়ে ঢুকবে না মহারাজ। দরজা কেটে বড় করতে হবে। যদি কিছু অর্থ সাহায্য দেন তো...

রানী : হ্যাঁ হ্যাঁ, গোপালকে একশো মোহর দিয়ে দিন।

মন্ত্রী : একটা দরজা বানাতে একশো মোহর! মহারাজ....

রাজা : আঃ মন্ত্রী, এটা রানীমায়ের নির্দেশ। যাও ওকে একশো মোহর দিয়ে দাও।

(মন্ত্রী কাচুমাচু মুখে মোহরের থলে তুলে দিল)

গোপাল : (চোখ টিপে) এটা উপড়ি। প্রণাম মহারাজ। দীর্ঘজীবী হন আপনি ও মহারানী।

৮ম দৃশ্য

(মাঝে মাঝেই বিদ্যুৎ ও বাজ পড়ছে। রাজা ও রানী ঘরে পায়চারী করছে)

রাজা : টানা চার দিন ধরে বৃষ্টি। রানী, চারদিকে তো জলে থৈ থৈ করছে। মানুষজন ঘর থেকে বের হতে পর্যন্ত পারছে না।

সেনাপতি : আসবো মহারাজ?

রাজা : কী হলো সেনাপতি? কোনও সংবাদ...

সেনাপতি : হ্যাঁ, দুঃসংবাদ মহারাজ। বন্যায় ভাসছে কৃষ্ণনগর। অনেক মাটিরবাড়ি ভেঙে পড়েছে। সৈন্যরা উদ্ধারে কাজে নেমেছে ঠিকই, কিন্তু ওদের কাছে তো কোনও বোট বা নৌকো কিছুই নেই মহারাজ। বন্যায় ভেসে যাচ্ছে বহু গবাদি পশুও।

রানী : কেন? আমাদের রাজ্যে নৌকো নেই কেন?

রাজা : আসলে, কৃষ্ণনগরে তো বন্যা হয় না মহারানী। তাই...

রানী : বাঃ গুণধর সেনাপতি আপনি, এ্যাতো মানুষ, পশু জলে ভাসছে। আর তোমাদের কাছে একটাও নৌকো নেই, তাই তো?

(হঠাৎ গোপালের প্রবেশ সঙ্গে বউ ও কচিকাঁচারা)

গোপাল : মহারাজ, বলেছিলাম না আপনাকে, বুদ্ধি থাকলে পুরস্কারকে ঠিক কাজে লাগানো যায়। এই নিন এঁদের উদ্ধার করে এনেছি। আপনার দেওয়া গামলার জন্য আবার আপনাকে প্রণাম জানাই মহারাজ। আর, এখনও যারা বাকি আছে, দেখি যতটা পারি গামলাতে করে এনে রাজপ্রাসাদের তিনতলায় তুলি। ওরা প্রাণে তো বাঁচবে। তাই না মহারাজ?

(গোপালের প্রস্থান)

রানী : দেখলেন তো রাজামশাই, গোপাল আমাদের গালে কেমন একটা বুদ্ধির চড় মেরে চলে গেল।

মহারাজ : হুম। আসলে গোপাল বুঝিয়ে দিল, ওর মতো বুদ্ধিমান সত্যিই খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

(গোপালের প্রবেশ সঙ্গে মন্ত্রী, স্ত্রী, গ্রামবাসীরা)

মহারাজ : কী হলো মন্ত্রী? এখন বুঝেছো? ও না থাকলে আজ প্রাণেই মারা পড়তে। বুঝলে তো, বুদ্ধি যার বল তার।

মন্ত্রী : তা যা বলেছেন মহারাজ।

(আবার গোপালের প্রস্থান)

রানী : মন্ত্রী, একটা কথা তোমায় বলে রাখি শোনো। কখনও কাউকে হিংসা করবে না। চেষ্টা করবে বড় মনের মানুষ হয়ে ওঠার। গোপাল না থাকলে এতো জনের প্রাণ যেমন বাঁচানো যেত না, তেমনি বুদ্ধি না থাকলে গামলাও আজ নৌকো হতো না বুঝলে?

(মন্ত্রীর মাথা নীচু)

(এবার গোপাল বাকি সভাসদদের নিয়ে রাজার বাড়িতে প্রবেশ করল)

কবি : আমাদের বাঁচালো গোপালের গামলা
এবার শিক্ষে নাও মন্ত্রী ও আমলা।
সকলে একসাথে,
জয় গোপালের জয়
জয় মহারাজের জয়।
জয় মহারানীর জয়।

(চোখ টিপে দর্শকদের দিকে তাকালো গোপাল)

জন্মগল্প

ঋক তান

কত রাশি যন্ত্রণা রোজ জমা হয় বুকে
তবুও নির্বাক সমাজ কয়েকটা যুগ
কয়েকটা বসন্ত প্রতিদিন গুণে নিজেদের
স্তম্ভিত করে বলে,
আমি কয়েকটা যুগ নির্ঘুম কাটিয়েছি
তবুও তোমার পাতার ডগায় চুয়ে পড়া বর্ষা
আমাকে ভেজাতে পারেনি
পারেনি নিজের অজান্তে আকাশভাঙা
বৃষ্টি এনে মেঘলায় ঢেকে রেখেও
সূর্যের বিকিরণকে বন্ধ করতে
হাজার যুক্তির খোঁজ করতে করতে
ফুলের সুগন্ধ নিতে নিতে
একরাশ অভিমানী নীরবতায় স্থান পেয়েছে
চোখের জলে ভিজিয়ে দেওয়া শুকনো ধুলো
জীবনের অনেক লাঞ্ছিত রুদ্র বৈশাখে
তপ্ত দিনে অনন্ত স্তব্ধ প্রহরে বিনিদ্র রাতে
ব্যর্থ ভাটিয়ালি গানে পৃথিবীর সব গান
মিশে গিয়ে ঝিনুক স্বপ্নগুলো উত্তরণে দৃঢ় অঙ্গীকারে
হাজার শব্দের মাঝে ভেসে আসে নিথর শব্দশঙ্খ
বাউন্ডুলের শব্দ প্রতিসরণের পথ ক্রমাগত বাঁকে বাঁকে
এসে দাঁড়ায় নীরব আকাশে অদ্ভুত আঁধারে
ফেলে আসা বুকে চাঁদের নদীর বালুচরীর আলোয়
সমাজচ্যুত সেই একজন রুদ্র ঊষর মরু প্রান্তরে
জীবনের বেঁচে ওঠার সব শর্ত নতজানু হয়ে পড়ে থাকে।
গাঢ় অন্ধকারে ছন্নছাড়া জীবন
অনেক অনেক দূরান্তরে।
সেখানে থাকে পিপাসার্ত আর মরীচিকা।

কবিতা